বি বি এম কে বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ

B. B. M. K. UNIVERSITY, DHANBAD

রানী (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) এবং রানী চন্দর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ

RANI (NIRMALKUMARI) MAHALANABISH EBONG RANI CHANDAR SMRITIKATHAY RABINDRANATH

পি এইচ ডি নিবন্ধীকরণের জন্য সংক্ষিপ্তসার

Synopsis for Ph. D. Registration

বীণাপাণি ঘোষ

বিভাগ - বাংলা

BINAPANI GHOSH

Department - Bangla

RANI (NIRMALKUMARI) MAHALANABISH EBONG RANI CHANDAR SMRITIKATHAY RABINDRANATH

Synopsis for Ph.D Registration

Binapani Ghosh

Department-Bangla

Preface

আমি বীণাপাণি ঘোষ, অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বিনোদবিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল ইউনিভার্সিটি থেকে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি এবং বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি কোর্স ওয়ার্ক করছি। এই বাধিত হবো। আমার গবেষণার বিষয় হল --

‘রানী (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) এবং রানীচন্দরস্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ’।

আমি আমার গবেষণা-নির্দেশক হিসেবে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. কৌশিক দাশগুপ্তকে পেতে আগ্রহী।

বীণাপাণি ঘোষ

গবেষক

বিনোদবিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল ইউনিভার্সিটি

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড, ভারত

সূচীপত্র (Index)

১ ভূমিকা 5

২ প্রথম পরিচ্ছেদঃ রানী(নির্মলকুমারী)মহলানবিশ: জীবন ও সাহিত্য 12

৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ রানী (নির্মলকুমারী)মহলানবীশের স্মৃতিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব

ও প্রতিভার বিবিধ স্তরবিন্যাস 15

৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রানী (নির্মলকুমারী)মহলানবিশের স্মৃতির রেখায়

রবীন্দ্র পরিমণ্ডল 19

৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রানী মহলানবিশের ব্যক্তিত্বের

উদ্ভাসন ও রবীন্দ্রমানসে রানী(নির্মলকুমারী) মহলানবিশের অবস্থান 20

৬ পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ রানী চন্দঃ জীবন ও সাহিত্য 22

৭ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ রানী চন্দের স্মৃতিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার

বিবিধ স্তরবিন্যাস 24

৮ সপ্তম পরিচ্ছেদঃ রানী চন্দর রচনায় রবীন্দ্র পরিমণ্ডল 26

৯ অষ্টম পরিচ্ছেদঃ রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রানী চন্দের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন ও

রবীন্দ্রমানসে রানী চন্দের অবস্থান 27

১০ উপসংহার 29

১১ গ্রন্থপঞ্জি 30

Introduction:

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তিনি যেখানেই গেছেন, যখন গেছেন, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে এখনো অনেক আলোচনার বাকি আছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই তাঁর জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছিল বিবিধ গ্রন্থ। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে আশ্রমের রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ মানুষজন তাঁকে নিয়ে লিখেছেন কিন্তু তবুও সেসব গ্রন্থে আমরা যা পাই তা রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর ও মহত্তর পরিধিতে ধরার ও জানার চেষ্টা। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে গেলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে খুঁজতে হয়। কিন্তু সে কাজ বোধহয় তেমনভাবে হয়নি যেমনটা করতে চেয়ে ছিলেন রানী চন্দ ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ। তাঁদের রচনায় তিনি ধরা পড়েছেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিবিধ স্তর, নানা বিস্তার ও বহুমুখী প্রতিভা প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে ধরা পড়েছে ভিন্নরূপে, ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে। নারীর কলমে তাতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে যা বিস্তারিত ভাবে জানার চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র জীবন কথা রচিত হয়েছে দুই বিদগ্ধ পন্ডিত মানুষের কলমে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। তাঁদের একজন হলেন প্র. কু. মুখোপাধ্যায় এবং অন্যজন হলেন প্র. পাল। প্রভাতবাবু রচনা করেছেন রবীন্দ্র জীবনী। প্রথম থেকে চতুর্থ এই চারটি খন্ডে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা কাহিনির সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির উৎস এবং প্রকৃতিকে তিনি ধরেছেন আর প্র. পালের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর পরিসরে ধরার, কিন্তু সে চেষ্টা পণ্ডিতের চেষ্টা। সে দিক থেকে রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ ও রানী চন্দর স্মৃতিকথা আমার কাছে নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছে। আমার মুগ্ধতা এবং বোধের দ্বারা আমি প্রাণিত হয়েছি সেই ভিন্নতর স্বাদকে সকলের কাছে পরিবেশন করার আর সেই চেষ্টা থেকেই আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে আমি গ্রহণ করেছি ‘রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ ও রানী চন্দর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ’ এই বিষয়টি।

রবীন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে রেণুকা(রানী)। পোশাকী নাম অতসী। মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন কবি কিন্তু যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে রানী অকালে মারা যায়। অনেক মৃত্যু যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে সহ্য করেছেন। মেজো মেয়ের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তাঁর বুকটাকে ভেঙে দিল। স্ত্রীর প্রয়াণের পর মেয়ে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন রবীন্দ্রনাথ। মা, বাবা দুইই যে তখন তিনি। বায়ু পরিবর্তনে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায়। পাইন বনের হাওয়া নাকি যক্ষারোগীর পক্ষে খুব ভালো। সারাদিন সেবা, পরিচর্যা আর সন্ধ্যেবেলায় মেয়ের মন ভালো রাখার জন্য তাকে নিয়ে কবিতা লেখা। পিতার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে রানী মারা গেল। যাবার সময় সে বাবার হাত আঁকড়ে ধরে পিতা নোহসি বলতে বলেছিল। মাতৃহারা মেয়ের জীবনে বাবাই যে ছিলেন সব। তাই যাবার সময় ও বাবার হাতটুকু ধরে পার হতে চেয়েছিল মেয়ে, যেতে চেয়েছিল সেই পরম পিতার কাছে।

জীবনের বিচিত্র বাঁকে কন্যা রানীকে হারিয়ে পরবর্তী জীবনে কবির কাছে এলেন কন্যাসমা অন্য দুই রানী। আশ্রমে রানী মহলানবিশের আগমণ উনিশশো তেইশ সালে আর রানী চন্দ এলেন ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের মনের কোথাও কি তাঁদের দেখে তাঁদের নাম ডাকতে গিয়ে মেজো মেয়ে রানীর কথা মনে পড়তো না? পড়তো।

তাইতো 'পিতা নোহসি' শ্লোকের মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে রানী মহলানবিশকে বলেছেন তাঁর মেজো মেয়ের কথা। কন্যাসমা ভেবেছেন বলেই হয়তো এই দুই রানী রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের কাছটিতে আসন গ্রহণ করতে পেরেছিলেন! তাঁর কাছ থেকে পিতৃস্নেহ আদায় করে নিয়েছিলেন দুজনেই। এই দুই নারীর কলমে যখন রবীন্দ্রনাথের কথা উঠে আসে তখন রবীন্দ্র মন ও মনন যেন আলাদা করে, অনেক মরমী করে ধরা পড়ে পাঠকের কাছে। তাঁদের স্মৃতিকথায় সেই রবীন্দ্রনাথের বিবরণ খুঁটিনাটি জানতে পেরেছি এবং সেটাই জানাতে চেয়েছি ও তার থেকে নতুন দিকের সন্ধান করতে চেয়েছি আমার এই গবেষণাকর্মে।

Statement of the Problem:

(সমস্যা নিরূপণ)

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন অনেকে কিন্তু তাঁর মনের খবর, তাঁর সৃজনশীলতা, তাঁর তুলিতে এক একটি ছবি ফুটে ওঠা, তাঁর কলমে এক একটি লেখার জন্মলাভ করার অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি সেগুলিতে তেমনভাবে ধরা পড়েনি। দেশের উত্তাল সময়ে রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে তাঁর অবস্থান, তাঁর মানসিকতা, জটিল সময়কে স্থির চিত্তে গ্রহণ ও উত্তরণ, ক্রমশ বিদেশের মানুষের কাছে দেশের মুখপাত্র হয়ে ওঠা - এসব কিছুর বর্ণনা আছে রানী মহলানবিশ এবং রানী চন্দর রচনায়। কংগ্রেসের জন্ম থেকে শুরু করে উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিঃ (রবীন্দ্র প্রয়ানের পরবর্তী বৎসর) পর্যন্ত অর্থাৎ কংগ্রেস স্থাপনের সময় কাল থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশি রাজনীতির প্রভাব ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়।

যেবার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং রানী কবির সাথে যান সেবার ইতালির রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনির ব্যবহার, অত্যাচার ইত্যাদি নিয়ে অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট আচরণে ইউরোপের দেশগুলোতে রীতিমত তোলপাড় চলছিল। সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন মুসোলিনি। কুটিল রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়লেন রবি। অধ্যাপক ফর্মিকী এবং তুচ্চি এই দুই ভারতবিদ আশ্রমে যখন ছিলেন তখন তাঁদের সাথে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা গড়ে ওঠে। মূলত ফর্মিকীর আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ সেবার য়ুরোপ যাত্রা করেন কিন্তু ভাষার বোধগম্যতার অভাবে তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর বক্তব্যকে মুসোলিনির সরকার কিভাবে ফ্যাসিজমের পক্ষে ব্যবহার করছে। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ তাঁর বান্ধবীর সাহায্যে সংবাদপত্রগুলি পড়ে সে কথা জানতে পারেন। এর বিবরণ পাই নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থটিতে। কবির ইতালি সফর দেশে এবং বিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নানা অভিযোগ উঠছিল কবির নামে। রবীন্দ্রজীবনের এই বিশেষ অধ্যায়টির পরিচয় জানা যায় রানী মহলানবিশের বর্ণনা থেকে।

'ঘরোয়া' গ্রন্থে রানী চন্দর লিখে নেওয়া ও অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক বলা ঘটনাপ্রবাহ রবিকার অন্যদিকটিকে চিনিয়ে দেয়। তিনি শুধুমাত্র পায়ের উপর পা তুলে বসে থেকে সময় কাটাননি, দেশের জন্য কতখানি পরিশ্রম

করেছেন কতখানি চিন্তা করেছেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'ঘরোয়া' গ্রন্থে। অবনীন্দ্রনাথ বিবৃত ঘটনাগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন পড়েন, তখন রানীকে খুব খুশি হয়ে আরো লিখে আনতে বলেন। রানীকে পাঠিয়ে দেন জোড়াসাঁকোয়। তিনি বলেছিলেন- "কি সুন্দর অবন সেকালের আমাকে তুলে ধরেছে। সবাই ভাবে আমি চিরকাল বাবুয়ানি করেই কাটিয়েছি পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। কিন্তু কিসের ভিতর দিয়ে যে আমাকে আসতে হয়েছে, এই লেখাগুলোতে তা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।" (গুরুদেব, রানী চন্দ, পৃষ্ঠা - ১৪৯।)

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সরকারি অনুদান ছাড়াই প্রকৃত অর্থেই এক অনন্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার অসাধারণ ইতিহাস লেখা আছে এই দুই লেখিকার গ্রন্থে। বিশেষত রানী চন্দর গ্রন্থে বিশ্বভারতী গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে অমানুষিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধ বয়সেও যেসব চিন্তা, উদ্বেগ এবং ভালোবাসা তার প্রকাশ আমরা দেখি। কিছু কিছু ছবি ফুটে উঠেছে রানী(নির্মলকুমারী) মহলানবিশের স্মৃতিকথায়। বিশ্বভারতী গড়ে ওঠার পিছনে এর বিভিন্ন দেশি-বিদেশি আশ্রমিকদের কৃচ্ছ্রসাধন, তাঁদের আন্তরিকতা এবং তাঁদের জীবনের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এঁদের দুজনের রচনায়, বিশেষত রানী চন্দর রচনায়। রবীন্দ্রনাথ দেশের অন্যান্য প্রদেশে কিভাবে সংবর্ধিত হয়েছেন, কিভাবে তিনি তাঁর নাচ, গান ও নাটকের দল নিয়ে টাকার জন্য নানা জায়গায় ঘুরছেন তার আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছে দুই রানীর বিভিন্ন লেখায়।

আরো একটি বিষয় আমার গবেষণাকর্মের একটি আকর্ষণীয় দিক। সেটি হচ্ছে এখানে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে উপরোক্ত দুই লেখিকার ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার উদ্ভাসন যেমন দেখানো হয়েছে তেমনই রবীন্দ্রমানসে এই দুই রানীর অবস্থান কেমন? এঁদের জন্য রবীন্দ্রনাথ কী কোনোভাবে উদ্দীপিত কোথাও? রবীন্দ্র সৃজনে এঁদের দুজনের ভূমিকা কী? এই সমস্যাগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

Problem to be investigated:

(সমস্যা অনুসন্ধান) বিষয়ের অনুসন্ধানে আমি চয়ন করেছি রানী মহলানবিশ এবং রানী চন্দর রচনাগুলি। রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্ত্বা, আলাপচারিতা, দার্শনিকতা, রসরসিকতা ইত্যাদির পরিচয়ের পাশাপাশি গীতিকার ও গায়ক রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ অভাজনদের প্রতি সহানুভূতিশীল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিরও স্বরূপ সন্ধান করতে পেরেছি।

রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে'। 'শেষের কবিতা' রচনার ইতিহাসটি যেমন সরস বর্ণনার মাধ্যমে চমকপ্রদভাবে তুলে ধরা হয়েছে, 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি রচনার সাথে সাথে সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদের উপন্যাস 'শেষের কবিতা' কিভাবে রচনা করছেন তার রহস্যটি জানিয়েছেন নির্মলকুমারী। আর একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল রবীন্দ্র-অরবিন্দ সাক্ষাৎ। রবীন্দ্র মানস, রবীন্দ্র দর্শনও পরিস্ফুট হয়েছে অরবিন্দ প্রসঙ্গ আলোচনায়। ঋষি অরবিন্দ ছাড়াও গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তি উজ্জ্বলরূপে মূর্ত হয়েছেন -যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ (শীল), অ্যানি বেসান্ত, সি. এফ. এন্ড্রুজ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ।

'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থটি রবীন্দ্র-ব্যক্তিসত্ত্বার স্বরূপ নির্ণয়ে খুবই জরুরি। এটি থেকে ১৯২৬ এ রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে যে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসোলিনি সরকারের আচরণ, রবীন্দ্রনাথকে না জানিয়ে তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করে ফ্যাসিজম এর সপক্ষে ব্যবহার করা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এসেছে এখানে। রমা রোঁলা, ক্রোচে সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে কবির দেখা হওয়ার প্রসঙ্গও আছে এখানে।

এছাড়াও এখানে পাওয়া গেছে ভোজনরসিক রবীন্দ্রনাথ, চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথ সহ কবির আরো অনেক বিচিত্র দিকের পরিচয়। আছে রবীন্দ্রসৃজনের বহু অজানা তথ্য।

রানী চন্দর গ্রন্থগুলি থেকে অজানা অচেনা গুরুদেবের ব্যক্তিসত্ত্বা ও প্রতিভার নানাবিধ স্তর উন্মোচিত হয়েছে এখানে। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সারাদিনের নানা কার্যকলাপ ধরা পড়েছে রানী চন্দর রচনায়। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গ-রসিকতা, জীবনের শেষ দিকে নানা রকমের শারীরিক বেদনা, চলার কষ্ট, চোখে দেখতে না পাওয়া, কানে শুনতে না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ, এত যে তিনি ছবি আঁকার প্রতি ভালোবাসা অথচ সাংসারিক নানা জটিলতার কারণে ছবি আঁকতে না পারার কষ্ট ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি বিষয় এখানে বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক বাড়িতে বেশিদিন থাকতে ভালবাসতেন না, বারবার বাড়িবদল করতেন। বাড়ি প্রসঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তা ভাবনা, স্থাপত্য কৌশল অবলম্বন করে সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখরা কিভাবে একের পর এক বাড়ি বানাচ্ছেন, কোনো বাড়ির আসবাবপত্র কেমন পছন্দ করছেন গুরুদেব, কিভাবে সাজাচ্ছেন সেই ঘর, কতদিন সেখানে থাকছেন ইত্যাদি নানা বিবরণ এখান থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া রানী তাঁর পোশাক সম্পর্কেও বিস্তারিত লিখেছেন। তাঁর পোশাকের স্বকীয়তা, চমৎকারিতা, ঋতু অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার ইত্যাদি নানা গোপন তথ্য এখানে তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন। সাংসারিক, অতিথিপরায়ন, শিল্পী, নিসর্গপ্রেমী এবং ভ্রমণপিপাসু রবীন্দ্রনাথের বিবরণ এখানে আছে। বিদেশ থেকে কিভাবে বাটিক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পকর্ম, চামড়ার ওপর বাটিকের কারুকার্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্পের কাজ নিয়ে আসছেন এদেশের সাধারণ গ্রাম্য লোকজনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য, তার বিবরণ পাওয়া যায় রানী চন্দর রচনায়। শান্তিনিকেতন ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলের সমস্যা দূরীকরণের প্রয়াস ইত্যাদির চিত্রও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক সকল দিক থেকে- এই ছিল তাঁর প্রয়াস।

দুজনেই তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও কলম ধরেছেন নানা পত্রপত্রিকার জন্য। সেগুলিও আমার সমস্যা অনুসন্ধানে সাহায্য করে চলেছে।

Objective of the Research Work:

(গবেষণার উদ্দেশ্য)

নারীর কলমের স্বর পুরুষের থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন হয়ে ওঠে তাঁদের চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, দৃষ্টিকোণ, বিচারবুদ্ধি, সংবেদনশীলতা ও মননের ভিন্নতার কারণে। তার ওপর এই নারী যদি হন দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রত্যক্ষদর্শী, সঙ্গী, সহচর তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর বর্ণনা অন্যদের থেকে পৃথক আস্বাদ দান করে পাঠক, গবেষক, অনুরাগীদের অন্তরে। রচনা করে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও অভিনব জীবনকথা। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ও জীবন বৃত্তান্ত অনুসন্ধানই মূল লক্ষ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্যগুলি হল ১) দেশীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান করা ২) রবীন্দ্র জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি ঘটনার উপর আলোকপাত করা যা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে সাহায্য করবে। ৩) বিশ্বভারতীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করা। ৪) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আশ্রমিকদের ইতিহাস সংগ্রহ করা ৫) সমসাময়িক বিশিষ্ট মানুষের পরিচয় জানা ও জানানো ৬) বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে আগত বিভিন্ন বিদেশি ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করা ৭) দুই বিশ্বযুদ্ধ সাপেক্ষে রবীন্দ্র জীবনের সঙ্গে ইউরোপের সংশ্লিষ্ট রাজনীনীতির নানাদিক তুলে ধরা।

Hypothesis:

(ফলাফলের অনুমান)

রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্যা দুই গুণী মহিলার স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার নানা অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত দিকগুলি উন্মোচিত হবে যা থেকে সম্ভাবনা দেখা দেবে আরো নতুন দিকদর্শনের। নতুন দিশার সন্ধানে এগিয়ে আসবেন অনেক রবীন্দ্রভক্ত ও অনুরাগী।

Research Design and Methodology:

(গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি)

আমার গবেষণাকর্মটিকে আমি সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই। আমার কাজটির সম্ভাব্য বা প্রস্তাবিত অধ্যায় বিভাজন এইরকমঃ-

ভূমিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশঃ জীবন এবং সাহিত্য।

২য় পরিচ্ছেদঃ রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবীশের স্মৃতিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিবিধ স্তরবিন্যাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশের স্মৃতির রেখায় রবীন্দ্র পরিমণ্ডল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রানী মহলানবিশের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন ও রবীন্দ্রমানসে রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশের অবস্থান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ রানী চন্দঃ জীবন ও সাহিত্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ রানী চন্দর স্মৃতিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিবিধ স্তরবিন্যাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ রানী চন্দর রচনায় রবীন্দ্র পরিমণ্ডল।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রানী চন্দর ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন ও রবীন্দ্রমানসে রানী চন্দর অবস্থান।

উপসংহার।

আমি আমার কাজটি ‘তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ’ বা ‘তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যা’ (Data Collection and Data Analysis) এই পদ্ধতিতে করার উপায়টি বেছে নিয়েছি ।

Tools to be used in the collection of data and analysis:

(তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ)

মূলতঃ আকর গ্রন্থগুলি এবং সহায়ক গ্রন্থগুলি অনুসরণ করেই তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যার কাজটি চলছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করছে। গ্রন্থাগারের সহায়তা এবিষয়ে সবিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ কাজে লেগেছে এবং শেষ পর্যন্ত লাগবে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন পাঠাগারের সহায়তা। সেখানে রানী চন্দ ও রানী মহলানবিশের রচনা, চিঠিপত্র আলাদা আলাদা ফাইলে রক্ষিত আছে।
আজকের দিনে আন্তর্জাল মাধ্যম একটি বড়ো সহায়ক। নানা ই-জার্নাল, সাইট, তথ্য সংগ্রহে যেমন এখানে কাজে লাগছে তেমনই তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তির সহায়তা অনস্বীকার্য। কম্পিউটার, সিডি, ডিস্ক ইত্যাদির সহায়তা নেওয়া হয়েছে, তাতে কাজটি অনেক অনেক দ্রুত, অনেক নিরাপদ ও মজবুত উপায়ে করা সম্ভব হচ্ছে। এখানে ভয়েস টাইপিং এর সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে মাঝে মাঝে।

Significance of the Proposed Work

(সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব)

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে দুই রানীর লেখনীতে। এই গবেষণার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, রানী মহলানবিশ ও রানী চন্দর দ্বারা রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও কর্ম, ও সৃষ্টি কোনোভাবে প্রভাবিত হচ্ছে কিনা তার একটি অনুসন্ধান এখানে আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনাচরণ থেকে রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ, রানী চন্দ যা শিখেছেন, যা জেনেছেন তাঁদের জীবনে যা আয়ত্ত

করেছেন তার পরিচয় যেমন পাই, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে তাঁদের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন কেমন ঘটেছে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার তেমনি পাই রবীন্দ্রমননে তাঁদের স্থান কতখানি, তাঁদের ভূমিকা কতখানি, তার পরিচয় । এই দুজনের গ্রন্থে নারীর স্মৃতিকথায়, নারীর মননের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে নারীর দর্শনে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ধরা পড়েছেন তার জীবন্ত দলিল হতে পারে এই গবেষণা কর্মটি।

Contribution of the existing Knowledge:

(বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের উপযোগিতা)

আমার গবেষণাকর্মটি অভিনব একটি বিষয়। এর পূর্বে এই দুজন নারীর স্মৃতিচারণাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কাজ তো হয়ই নি এমনকি স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ নিয়েও কোনো গবেষণা হয় নি। তবে রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্যা, প্রাণিতা এই দুজনকে চিনতে, তাঁদের গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনার সত্যতা ও ভিন্নতাকে জানতে, গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন বরেণ্য ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে অন্যের দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করতে আমি বেশ কিছু গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছি। রানী মহলানবিশ ও রানী চন্দ রচিত সব গ্রন্থগুলিই আমার গবেষণার আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেও অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। প্র. কু. মুখোপাধ্যায় এর “রবীন্দ্র জীবনী” গ্রন্থের চারটি খণ্ড, প্র.কু.পালের ‘রবিজীবনী’ গ্রন্থের নয়টি খণ্ড, এবং রথীন্দ্র রচিত “পিতৃস্মৃতি” গ্রন্থটি এ বিষয়ে আমাকে কিছুটা সহায়তা দান করেছে। একনজরে রবীন্দ্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে খুঁজতে প্র. মুখোপাধ্যায় রচিত “রবীন্দ্রজীবনকথা” গ্রন্থটিও আমাকে সাহায্য করেছে। এছাড়া আমি পেয়েছি সৌরীন্দ্র মিত্রের “খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে” গ্রন্থটি। অমিতা সেন রচিত আনন্দ সর্বকাজে গ্রন্থটিও বিশেষ সহায়ক হয়েছে। রানী চন্দকে নিয়ে কবিতা চন্দর লেখা ‘রানী চন্দ/জীবন, কুড়োনো কথায়’ প্রতিমা ঠাকুর রচিত ‘নির্বাণ’, কৃষ্ণ কৃপালনী রচিত ‘Rabindranath Tagore: A Biography’ প্রভৃতি বইগুলিও বিশেষ সহায়ক হয়েছে। নির্মলকুমারী মহলানবিশের দেশ পত্রিকায় লিখিত ‘পুরানো স্মৃতি’ সহ কিছু প্রবন্ধ।

Future Work:

(ভবিষ্যত সম্ভাবনা)

প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথা থেকে আরও অনেক কাজ করা সম্ভব। তাছাড়া নারীর স্মৃতিকথা বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। এরকম আরো অনেক আছে যে বিষয়গুলির দ্বারা নানা উল্লেখযোগ্য জীবনের চর্চা করা যায়। আমার এই গবেষনা কর্মের দ্বারা কোনো গবেষক সে কাজে উদবুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পাবেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এখনো এ ধরণের কাজ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে বা অন্য কোনো বিষয়কে নিয়ে স্মৃতিকথা ভিত্তিক কোনো গবেষণা কর্ম হলে সেখানে আমার গ্রন্থটি তাঁদের কাজে লাগবে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন জানতে অপরিহার্য হয়ে উঠবে এই গবেষণাকর্মটি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ : জীবন ও সাহিত্য

নির্মলকুমারী মহলানবিশের জন্ম ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর আদরের ডাকনাম ছিল রানী। পিতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছিলেন কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক, পরে স্বনামধন্য অধ্যক্ষ। তাঁর পিতার বাড়ি ছিল বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী খোরসা থানার অন্তর্গত হিজলাবট গ্রামে। রানীর দাদা অশোক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যারিস্টার হন। তিনি তখনকার প্রখ্যাত নায়িকা কাননদেবীকে বিবাহ করেন। পিতার তীব্র অমত থাকায় পিতার মৃত্যুর পর অশোক বিবাহ করেন। রানী ও তাঁর স্বামী এ বিবাহ যেমন মেনে নিয়েছিলেন তেমনি বিবাহের পর অশান্তি ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকায় কানন ডিভোর্স চাইলে সেখানেও তাঁরা সহযোগিতা করেন কাননকে ।

প্রশান্ত ছিলেন অধ্যাপক, প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ। বিশ্বভারতীর প্রথম জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে ১০ বছর কাজ করার পর রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মানুষের কল্যানে রাশিবিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট গড়ে তোলেন। ‘রাশিবিজ্ঞান’ পরিভাষাটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। প্রশান্তর পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ দেবেন্দ্রনাথকে জানতেন। ছোটবেলা থেকেই পিতামহর হাত ধরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎসবে যোগ দিতে যেতেন প্রশান্তচন্দ্র। সেখানের অনুষ্ঠানেই নির্মলকুমারীর তথা রানী মহলানবিশের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তাঁর। দীর্ঘদিনের প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করার পথে দুই পরিবারই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত প্রশান্তর মামা ডঃ নীলরতন সরকারের বাড়িতে তাঁর অভিভাবকত্বে ১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, শুক্লা একাদশী তিথি, ২৭ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩খ্রিঃ রাত ৯.৩০এ রবীন্দ্রনাথ ও আরো ৭জনের উপস্থিতিতে বিবাহ ঘটে। বিবাহে পৌরোহিত্য করেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। ‘বসন্ত’ নাটকটির অভিনয় সেরে কবি, দিনু, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিতা সেন, সুপ্রভা রায়, সাহানা দেবী প্রমুখকে সাথে নিয়ে বিয়েতে যোগ দেন। বিবাহের পর গান গেয়েছিলেন দিনু। বসন্ত সম্পর্কিত কিছু গান হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ গাইতে লাগলেন ‘এতদিন যে বসে ছিলেম’, ‘ও আমার চাঁদের আলো’ ইত্যাদি একের পর এক গান। রবীন্দ্রনাথ এই দিনই বসন্ত নাটিকার গানের খাতায় চার ছত্রের একটি উপহার কবিতা রচনা করেন। তাতে প্রথম পাতায় লেখা-প্রশান্ত, রাণী, / তোমাদের এই মিলন -বসন্তে ....।

ছত্রগুলি হল---- তোমাদের এই মিলন-বসন্তে

দিলেন কবি বসন্ত-গান আনি।

সুন্দর প্রেম সাজুক আনন্দে

পরুক গলায় সুরের মালাখানি।

পরের দিন বসন্ত নাটকের সব গানগুলির বাঁধানো পাণ্ডুলিপিটি তাঁদের উপহার দেন।

প্রশান্তচন্দ্র বিবাহের পূর্বেই গুরুদেবের নিকটজন ছিলেন। বিবাহের পরেও তাঁদের ঘনিষ্ঠতার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি বরং রানী এবং প্রশান্তচন্দ্র দুজনেই রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই রবীন্দ্রনাথকে 'কবি' সম্বোধন করতেন। রানী মহলানবিশ বিয়ের পর থেকে অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রিঃ থেকে ১৯৪১ খ্রিঃ, রবীন্দ্রনাথের প্রয়ান দিবস পর্যন্ত ১৮ বছর ধরে খুব কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, তাঁর অপার স্নেহ লাভ করেছেন, তাঁর সেবা যত্ন করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকতেন হেড নার্স, কখনো বা বলতেন প্রথমা। তাঁরা কখনো গিরিডিতে থেকেছেন, কখনও কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ গেছেন সেখানে। বরানগরে নিজেদের বাড়ি হলে বাড়িটির নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বাড়িতে একটি আম গাছ ছিল। তাই বাড়িটির নাম হয় আম্রপালি। রবীন্দ্রনাথের শেষ সময়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তাই তিনি সে সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি। রানী আক্ষেপ করে বলেছেন, যদি প্রশান্তচন্দ্র উপস্থিত থাকতে পারতেন তাহলে কলকাতা নয় আশ্রমেই শেষকাজ হতো। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেন যে কলকাতায় নয় আশ্রমেই তাঁর শেষকাজ হয়। তাঁদের সন্তান ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সম্পর্ক এই দম্পতি গড়ে তুলেছিলেন তাতে তাঁদের জীবনের শূন্যতা পূরণ হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কাউকেই তাঁর সেবা করতে দিতেন না। কিন্তু একদিন তাঁর বাড়িতে রবীকবির পিঠ যন্ত্রণা হলে রানী অনুমতি না নিয়েই পিঠে মলম মালিশ করে দেন। তখন থেকে কবি রানীর সেবা মাঝে মাঝে নিতেন এবং ঠাট্টা করে রাণীকে বলতেন হেড নার্স। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সময় গুলিতে রানী মহলানবিশ সব সময় তাঁর পাশে পাশে থাকতেন। সবসময় সাথেই ছিলেন।

গান ভালোবাসতেন রানী। নতুন কোন গান হলেই শুনতেন। প্রশান্তচন্দ্রকে চিঠি লিখে রবির খবর দিতেন। আশ্রমের অনুষ্ঠানে কবি তাঁকে চাইতেন। আমন্ত্রন জানাতেন। এলে যেতে দিতে চাইতেন না। রানী রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলাতেন। লিখেও রাখতেন তাঁর অভিজ্ঞতা।

কবির সঙ্গে তাঁর দুবার ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। একবার গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে আর একবার গিয়েছিলেন ইউরোপে এই দুবারের অভিজ্ঞতা তিনি লিখে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'লিখে রাখো'। এসব কথা যাতে হারিয়ে না যায় রানী তাই লিখতে থাকেন। কবির প্রয়াণ হলে রানী মহলানবিশের লেখা 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থটি খ্যাতি পায়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই আষাঢ় এটি প্রকাশিত হয়। তৃতীয় গ্রন্থটি হল "কবির সঙ্গে য়ুরোপে" ।

রবীন্দ্রনাথের নির্মলকুমারী মহলানবিশকে সাড়ে পাঁচশোর বেশি চিঠি লিখেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রকেও লিখেছেন। যত লিখেছেন তত পাওয়া যায়নি। রানী যতদিন বেঁচে ছিলেন রবিকবির কথা লিখেছেন কিছু পত্রপত্রিকায়। অনুধ্যান করেছেন সেই মহাপ্রাণকে। রানী কবির বিদায় বেলার শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারেননি। প্রশান্তচন্দ্র বেলঘরিয়ার গুপ্ত বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ; সেখান থেকে নাকি ফোন এসেছিল তাড়াতাড়ি

বাড়ি ফিরে যেতে। গিয়ে দেখলেন কেউ ফোন করেনি। জোড়াসাঁকো ফিরে এসে শুনলেন কয়েক সেকেন্ড আগে ডান হাত খানা কাঁপতে কাঁপতে কপালে ঠেকিয়ে শেষ বিদায় গ্রহণ করেছেন কবি। প্রশান্তচন্দ্র চলে গেলেন **১৯৭২** এ। ফাঁকা হয়ে হেল জীবনের চারপাশ। কবি (রবীন্দ্রনাথ) ও কবির পরম স্নেহের ‘অধ্যাপক’ তথা ‘সায়েন্টিস্ট’ তথা ‘সাংখ্যিক’ এর স্মৃতি আগলে আম্রপালিতেই ছিলেন কবির প্রথমা। **১৯৮১** খ্রিষ্টাব্দে তিনিও পাড়ি জমালেন অমরলোকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রানী মহলানবিশের স্মৃতিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিবিধ স্তর বিন্যাস

রবীন্দ্রনাথকে যেমন করে চিনেছেন, জেনেছেন রানী মহলানবিশ, তেমন করে সাধারণ মানুষের পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন কবির হৃদয়ের কাছটিতে। তিনি বলেন "অনেকবার অনেকের উপর রাগ করতেও দেখেছি কিন্তু কখনো কোন মানুষকে ছোট করতে দেখিনি। কবি বলেছেন, কারোর উপর রাগ করতে তিনি লজ্জা পান, মনে হয় নিজেকে ছোট করলেন। তাই তিনি বলেছেন, "মনকে প্রতিদিন বলি, শান্ত হও সমস্ত অন্যায়, সমস্ত বিক্ষোভের মধ্যে তোমাকে শান্ত থাকতে হবে নইলে তোমার হার হলো। এই পরাজয় যাতে না ঘটে সেই জন্যেই প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠে আমার শান্তং মন্ত্র স্মরণ করি। এরই ভিতরে আমার মন আশ্রয় পায়''।[১]

নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে অন্য একজনকে শান্তিনিকেতনের বুধবারের উপাসনার ভার দিয়েছিলেন। বিশেষ দিনগুলিতে নিজে করতেন। তারপর তাঁর মনে হয়েছিল যে এই কর্তব্যকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। এমনকি ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথকে ডিগ্রি দেওয়ার জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি শান্তিনিকেতনে আয়োজন করে। সেদিন সকালেও মন্দিরে উপাসনায় নিযুক্ত হন। তাঁর শরীর তখন ভালো নয়, অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে, ক্লান্তি হচ্ছে। তাই কেউ কেউ বলেছিলেন যে পরের দিন দুপুরে আবার সমাবর্তন উৎসব আছে তাই বারবার যাতায়াতে শরীর ক্লিষ্ট হতে পারে। অসহিষ্ণু হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠেছিলেন, "দেখ, তোরা এ জিনিসটাকে কি মনে করিস, জানিনে। মন্দিরের কাজটা আমার সমস্ত আশ্রমের অন্তরের জিনিস, এখানকার বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। বিদেশি অতিথি যাঁরা এসেছেন তাঁরা এই জিনিসটা দেখে না গেলে এখানকার সত্য রূপটিই দেখতে পাবেন না। আমাকে তোরা সব সময় কষ্ট হবে, ক্লান্তি হবে বলে ছোট করে দেখিস নে। কাল আমি আর সব কাজই করতে পারবো, শুধু মন্দিরের কাজটা করলেই আমার ক্লান্তি হবে?''[২] মনের জোরে শরীরের সব বাধা অতিক্রম করে উঠতেন তিনি। যেকোন রকম মিথ্যা কবিকে অসম্ভব পীড়া দিত। জীবনের প্রধান আদর্শ ছিল সব বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যকে স্বীকার করা। 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।' তাই কোন সময়ে কোন মানুষকে দূরে রাখতে চাননি। নির্মলকুমারী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি সাহিত্যে কোন চরিত্র একেবারে নিছক খারাপ করে আঁকেন নি কেন? তার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে "যদি তেমন মন নিয়ে সন্ধান করতে যাই, তাহলে তার ভিতরকার যেটুকু ভালো আছে দেখতে পাই"।[৩]

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথঃ- রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তা রানী মহলানবিশ কাছে বসে দেখেছেন শুনেছেন। উপনিষদের এক একটা শ্লোক যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মুগ্ধ হয়ে রানী বলেছেন কেন তিনি সেগুলো লিখে রাখেন না। ব্যক্তির দ্বৈতসত্ত্বার কথা তিনি আলোচনা করেছেন রানীর কাছে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ছোট আমি বড়ো আমির তাৎপর্য। বারবার এসব ব্যাখ্যা লেখার জন্য জোর করলে কবি বলেন, "এত ছোটখাটো

খুচরো কাজ, লেখা, মাসিক পত্রের দাবী, বিশ্বভারতীর কর্তব্য সব আমার মনের উপর এমন চেপে বসে থাকে যে আর ভালো লাগে না। তুমি না হয় কোথাও লিখে রাখো....... একটু ছুটি পেতে ইচ্ছে করে।"[৪] আবার এও বলেন, "তোমার একটা গুণ আছে যে তুমি আমার কাছ থেকে কথা টেনে বের করতে পারো, তাই তোমার কাছে আমি এতো বকে যাই"।[৫]

সত্যনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথঃ- যেকোন রকম মিথ্যা কবিকে অসম্ভব কষ্ট দিত। সব বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যকে স্বীকার করা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে'। তিনি কখনো কোনো মানুষকে দূরে রাখতে চাননি। তাই তাঁর মন্ত্র ছিল 'অসতো মা সদ্গময়' তিনি বলতেন, "এরচেয়ে বড় প্রার্থনা বোধহয় পৃথিবীতে কেউ উচ্চারণ করেনি। তাই প্রতিদিন নিজেকে বলি তুমি সত্য হও,পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্টিত কোরো"।[৬]

সহনশীল রবীন্দ্রনাথঃ - জীবনের গভীর শোকের সময়ে তিনি শান্ত থাকতেন। কনিষ্ঠা কন্যা মীরার একমাত্র পুত্র নীতুর যখন জার্মানিতে মৃত্যু হল তখন কবি ছিলেন বরানগরে রানী মহলানবিশের বাড়িতে। কবি দুঘন্টা চুপ করে বসেছিলেন। তারপর আবার সহজ মানুষ। অথচ লেখিকা জানতেন নীতু কবির কতখানি ছিল। রানী লিখেছেন, "একমাত্র দৌহিত্রের বিদেশে মৃত্যু হল; কী অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে সে সংবাদ গ্রহণ করলেন, এ দৃশ্য না দেখলে একটা বড় দিক অজানা থেকে যেত। 'শেষ সপ্তক' আর 'পুনশ্চ' এই দুইখানা বই-ই নিতুর অসুখ ও মৃত্যুর গভীর বেদনার মধ্যে লেখা"।[৭]

দরদী রবীন্দ্রনাথঃ- - সকল শ্রেণির মানুষের জন্যই তাঁর গভীর স্নেহ ও দরদ ছিল। প্রশান্তচন্দ্র অসুস্থ, নিজের অসুস্থতা ভুলে বারে বারে খবর নিচ্ছেন। গৃহভৃত্য বনমালীর বাড়িতে সমস্যা, খবর জানার জন্য বিচলিত হয়ে উঠছেন। একজন পাগল কবিতা লিখতে চাইলে তাকেও সময় দিচ্ছেন তার জন্য বেদনা অনুভব করছেন-- এইরকম অজস্র উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে রানী তথা নির্মলকুমারীর কলমে।

পশুপাখি সবার প্রতিই ছিল তাঁর দরদ। সকালে যখন চা খেতে বসতেন, পাখিদেরও ভোজ শুরু হয়ে যেত। শালিক, চড়ুই এমনকি কাকেদেরও বঞ্চিত করতেন না। নিজের হাতে জল, মুড়ি সব দিতেন। বলতেন, "সকালবেলা আমার অন্নসত্র বসেছে। চেয়ে দেখি আর ওদের এই সহজ আনন্দ দেখে খুশিতে মন ভরে ওঠে"।[৯] কুকুরের প্রতিও ছিল সমান দরদ। গাছ,লতা,ফুল সবকিছুর ওপরেই ছিল দরদ, মায়া, ভালোবাসা।

হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথঃ- হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসতেন কবি। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মাথায় টাক থাকার জন্য তাকে 'বলডুইন' বলে ডাকতেন। প্রশান্তচন্দ্র রিটার্ন টিকিট কাটা আছে বলে রানীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললে তাঁকে ঠাট্টা করে কৃপণ বলতেন। এমন অজস্র হাসিঠাট্টার উদাহরণ আছে রানীর রচনায়।

রাজনৈতিক আবর্তে শান্তচিত্ত ও ভদ্র রবীন্দ্রনাথঃ- **১৯২৬** সালে মুসোলিনির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণে স্বদেশে বিদেশে বিতর্ক হয়। সেবার রবীন্দ্রনাথের সাথে নির্মলকুমারী ও প্রশান্ত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

জাহাজে জায়গা না হবার অজুহাতে কার্লো ফর্মিকী প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী রানীকে অন্য জাহাজে যেতে বাধ্য করেন। তাঁরা তিনদিন পরে পৌঁছান কবির কাছে। অনেকেই মনে করেন যে, ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রকৃত মুখচ্ছবি গোপন রাখার ব্যাপারে এঁরা প্রতিবন্ধক হতে পারেন এমন আশঙ্কায় এঁদেরকে সাথে নেওয়া হয়নি । কবির সমস্ত বক্তৃতা এবং সাক্ষাৎকারের কাজ করেছিলেন ফর্মিকী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি বিবৃতিতে পরিবর্তন ঘটাতেন বলে জানা গেছে নির্মলকুমারী মহলানবিশের রচনায়। লেখিকা জানিয়েছেন দেশে এবং বিদেশে কবিকে নিয়ে একটি বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ইতালির সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানকার কাগজে সেসব কথা বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। সভায় যে ভাষণ দিতেন তা কাগজে ছাপা হতো মুসোলিনির আগ্রহে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিজমের সপক্ষে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বেনেদেত্তোর সাথে কবির দেখা করার খুব আগ্রহ থাকলেও ফর্মিকী তা হতে দিতে চান নি। দেখা হয় সেনাবাহিনির এক অফিসারের চেষ্টায়। দুজনের সাক্ষাতকারে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো সেসব প্রশান্তচন্দ্র লিখে রেখেছিলেন। পরে এ বিষয়ে তিনি ‘বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি’তে লিখেছিলেন। ইতালি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট নিতির সমালোচনা করেন রবি। তাই পরের বারের ইতালি সফর নিয়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ শান্ত চিত্তে সেসমস্ত সমালোচনা সহ্য করেছিলেন। বিশিষ্ট মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ- সকলের মন তো তিনি জয় করে নিয়েছিলেন আর তাইই তো ব্যবহার করার চেষ্টা! নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর য়ূরোপের সর্বত্র তিনি রাজার মতো সম্মান পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে বেশি স্পর্শ করেছিল ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে মানুষের ভালোবাসা। ভিয়েনাতে তিনি রানীকে বলেছিলেন- “যখন পুত্রশোকাতুরা মা, কি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে, আমাকে এসে বলে যায় যে আমি তাঁদের জীবনে শান্তি দিয়েছি, তাই তাঁরা আমাকে এত ভালোবাসে, তখন বুঝি গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়ে আমি আমার বড়ো আমিকে প্রকাশ করেছি,যার সঙ্গে এই প্রতিদিনের আমিটার অনেক তফাত”।[৮]

কবি রবীন্দ্রনাথঃ

রানী মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করতেন ‘কবি’ বলে। তাঁর রচনার সর্বত্রই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ‘কবি’ সম্বোধন করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলিও ‘কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে’, ‘কবির সঙ্গে য়ুরোপে’ ইত্যাদি শিরোনামের। কবিও তাঁকে লেখা চিঠির শেষে স্বাক্ষর করেছেন ‘কবি’ বলে। তিনি ‘শ্যামলী’র অনেকগুলি কবিতাই রচনা করেছেন নির্মলকুমারীর বরানগরের বাড়িতে বসে। গ্রন্থটি উতসর্গও করেছেন রানীকেই। কবিসত্ত্বাটিকে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন রানী।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নানা ক্রিয়াকলাপের চিত্রও ফুটে উঠেছে তাঁর বর্ণনায়। এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে রানী মহলানবিশের রচনায়।

তথ্যসূত্রঃ-

১ নির্মলকুমারী মহলানবিশ, বাইশে শ্রাবণ, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৬, ভাদ্র ১৪২৫। মিত্র ও ঘোষ,পৃঃ ১৬।

২ ঐ, পৃঃ ১৮।

৩ ঐ, পৃঃ ২২।

৪ ঐ, পৃঃ ৯।

৫ ঐ, পৃঃ ৯।

৬ ঐ, পৃঃ ২২।

৭ ঐ, পৃঃ ২৪ ।

৮ ঐ, পৃঃ ২২ ।

৯ ঐ, পৃঃ ৩২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রানী(নির্মলকুমারী) মহলানবিশের স্মৃতির রেখায় রবীন্দ্র পরিমণ্ডল

রানী মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের কাছের ছিলেন। তাই তাঁর কলমে উঠে এসেছে রবীন্দ্র আত্মীয়-পরিজনদের প্রসঙ্গ, এসেছে আশ্রমের লোকজনের কথা, এসেছে দেশি-বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নাম। তিনি এমন অনেক স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর গ্রন্থগুলিতে যা অনুসন্ধান করলে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য লাভ করতে পারবো। কিছু জনের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হলো-

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরে সাথে ছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতার নোট রেখেছিলেন তিনি এবং সেটি টাইপ করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ কিন্তু সেইসব নোট পাওয়া যায়নি। প্রশান্ত সেই সময়ে লেখা চিঠিপত্র, খবরের কাগজ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আর একটি নোট পরে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছিলেন। পিতাকে প্রথম সচেতন করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। প্রশান্তচন্দ্র সেখানকার কাগজের রিপোর্টগুলি ঠিকঠাক বুঝতে পারার জন্য একজন অস্ট্রীয় মহিলা কে নিযুক্ত করেন পরে বোঝা গিয়েছিল যে সে মুসোলিনির গুপ্তচর । ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রকৃত চেহারাটা সম্পর্কে প্রশান্তই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম সচেতন করেন। তাঁদের যখন রাজবন্দী করা হয় তখন নির্মলকুমারী গোপনে টিস্যু পেপারে তখনকার অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করে নিয়ে এসেছিলেন যেগুলি অবলম্বন করে পরে ‘কবির সঙ্গে য়ুরোপে’ গ্রন্থটি রচনা করেন।

ক্রোচের সাথে আলাপের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রশান্তচন্দ্রকে বলেছিলেন। প্রশান্ত এই নোট থেকে এই সাক্ষাৎকারটি পরে অক্টোবর ১৯২৬ সালে ‘বিশ্বভারতী’তে প্রকাশ করেন।

অরবিন্দ-রবীন্দ্রর মোলাকাত প্রসঙ্গ লেখিকার বর্ণনায়, কবির চিঠিপত্রে ‘কবির সঙ্গে দক্ষিণাত্যে’ গ্রন্থে নানাভাবে উঠে এসেছে। কবি অরবিন্দ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেটি এখানে গ্রন্থিত হয়েছে।

নলিনীকান্ত গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ ৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ এ লেখা একটি চিঠিতে অরবিন্দর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানিয়েছেন। জওহরলাল নেহরু ১৯৩৭- এ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হলে রানী মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে আসেন কবিকে দেখতে। ১৯৩৯ সালে সুভাষ দুদিনের জন্য আসেন। হিন্দীভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করতে এসেছিলেন জওহরলাল ১৯৩৯ সালের ৩১ জানুয়ারী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রানী(নির্মলকুমারী) মহলানবিশের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন ও রবীন্দ্রমানসে রানী মহলানবিশের অবস্থান

বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ প্রথম জীবনে ১০বছর সেক্রেটারি পদে কাজ করেন। প্রশান্তচন্দ্র বিবাহ করেন রানী (নির্মলকুমারী) মৈত্রকে। তাঁদের বিবাহে ছিলেন বেশ কয়েকজন আশ্রমিকসহ রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিবাহের আশীর্বাদ স্বরূপ তাঁদের হাতে তুলে দেন বসন্ত নাট্যের পাণ্ডুলিপি। প্রশান্তচন্দ্র ও রানী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে অনেকগুলি বিবাহবার্ষিকীতে আশীর্বাদ করে এক একটি কবিতা উপহার দিয়েছেন কবি। নির্মলকুমারীর সেবার মনোভাবটি ছিল বড় মধুর। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন প্রশান্তচন্দ্রর কোয়ার্টারে যান তখন খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা করতে পারেননি প্রশান্তচন্দ্র। কিন্তু বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে থাকলে তিনি রানীর সেবায়, রান্নায়, খাওয়া-দাওয়ায় অত্যন্ত খুশি হন। একবার ব্যথা হয় তাঁর পিঠে। তিনি কাউকে কখনো সেবা করতে দিতেন না কিন্তু রানী মহলানবিশ অনুমতি না নিয়েই তাঁর পিঠে মলম লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যথার উপশম হলে রবীন্দ্রনাথ খুশি হন এবং তখন থেকেই তাঁকে ডাকতেন হেড নার্স বলে। রানী মহলানবিশ কবির সারাজীবনের সেবার ভার নেন। শুধু কবির সেবা করেন নি, রবীন্দ্র সৃজনেও রানী মহলানবিশ এর ভূমিকা ছিল অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথ যেমন রানী চন্দকে দেখে ছবি এঁকেছেন, তাঁর ব্যবহার, সংসারে তাঁর ভূমিকা দেখে তিনি তাঁকে নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, সেরকম রানী মহলানবিশ কে নিয়েও রবীন্দ্র সম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে। কবি 'শ্যামলী' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন রানীকে এবং জানিয়েছিলেন যে এগুলি তাঁর জন্যই লিখিত। তিনি তখন ছিলেন বরানগরে। তাঁর নতুন গান বাঁধার সময় নির্মলকুমারী মহলানবিশ উদগ্রীব হয়ে থাকতেন এবং প্রশান্তকে খবর দিতেন কবি কবে কী সৃষ্টি করছেন। সব অনুষ্ঠানে রানীর হাজিরা রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত কাম্য ছিল। তাই প্রশান্তচন্দ্র আসতে না পারলেও রানী উপস্থিত হতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। যাবার সময় হলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়তে চাইতেন না। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের ব্যাখ্যা মুগ্ধ করেছিল রানীকে। উপনিষদের অনেকগুলি শ্লোকের ব্যাখ্যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে।

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন রানী মহলানবিশ ইউরোপেও গিয়েছিলেন। তখন সারা বিশ্বে ১ম বিঃযুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। মুসোলিনি ইতালিতে ফ্যাসিজম চালিয়ে যাচ্ছেন। বুদ্ধিজীবীরা তাঁর কাছে অত্যাচারিত। সেই অবস্থায় না জেনে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মুসোলিনির চক্রান্ত বুঝতে পারেননি কবি। তাকে যেসব স্থানে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল সেখানে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা বিকৃত করে ফ্যাসিজমের স্বপক্ষে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা খবর নিয়ে জানতে পারেন যে ঘটনাটি ঠিক কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত ভদ্র

রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারছিলেন না বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে পারছিলেন না। তাই সেখান থেকে তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পথ চাইছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তাঁরা সুইজারল্যান্ডে যান। য়ুরোপ ভ্রমণের বিভিন্ন বর্ণনা রানী মহলানবিশ গোপনে বিভিন্ন টিস্যু পেপারে লিখে নিয়ে এসেছিলেন যাতে মুসোলিনির চরেরা সেগুলি বাজেয়াপ্ত করতে না পারে। পরে তার থেকেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি রচিত হয়- 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে'। ইয়ুরোপ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাবকে জানতে বুঝতে হলে রানী মহলানবিশ এর এই বইটি দরকার। স্বদেশে ও বাইরে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তার প্রকৃত পরিস্থিতি এবং উত্তর এই বইটি থেকে পাওয়া যেতে পারে। রানী মহলানবিশ লেখার দিকে মনোযোগ দেননি কিন্তু তিনি দর্শন চিন্তা করতে ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে উপনিষদের শ্লোক গুলির ব্যাখ্যা শুনতে তিনি ভালবাসত... সেগুলির চমকপ্রদক ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে বারবার লিখতে বললে কবি তাকে বলতেন লিখে রাখার জন্য এভাবেই রানী মহলানবিশ রচনা দিকে মন দেন তাঁর তিনটি গ্রন্থই অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'বাইশে শ্রাবণ' প্রকাশিত হয় ১৩৭৬বঙ্গাব্দ, ২৫ বৈশাখ। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই আষাঢ় এটি প্রকাশিত হয়। তৃতীয় গ্রন্থটি হল' কবির সঙ্গে য়ুরোপে'।

পরবর্তীকালে তাঁর আরও দু-একটি গ্রন্থ বার হয়েছে যথা 'আমার কথা'। রানী মহলানবিশ যেমন করে রবীন্দ্রনাথের সত্তাকে চিনেছিলেন তেমন করে সাধারণ মানুষের পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। তাঁর বাইশে শ্রাবণ গ্রন্থটি প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ যখন কুন্নুরে অতিথি হয়েছিলেন তখন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর সঙ্গে ছিলেন ।সেখানকার নানা মজার ঘটনা যেমন এখানে বর্ণিত হয়েছে তেমনি আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি রচনা করেন পাহাড়ে ঘোরার সময়। শেষের কবিতা উপন্যাসটির সূত্রপাতের ঘটনাটি জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথকে বারবার তাড়া দিতেন রানী এটি লিখে ফেলবার জন্য। এমনকি ঠেলে বসিয়েও দিয়েছেন চেয়ারে। রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগের মত একটি জটিল দাম্পত্যজীবনের উপন্যাস রচনা করছেন তাঁর সাথে শেষের কবিতার মতো একটি অত্যন্ত রোমান্টিক উপন্যাস একই সাথে রচনা করছেন, ভেবে অবাক হয়ে যেতেন রানী। রানী মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তুমি না থাকলে হয়তো শেষের কবিতা রচিত হত না'। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক লেখায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা আছে রানীর। তাঁকে নিয়ে কবিতাও রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পাঁচশোর বেশি চিঠি দিয়েছিলেন রানীকে। সেই চিঠিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে করে বোঝা যায় কবির প্রিয় ছিলেন তিনি, যাঁর কাছে কবি তাঁর হৃদয় খুলে দিতে পেরেছিলেন। এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের সৃজনে ও মননে রানীর একটি বিশেষ স্থান ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রানী চন্দ : জীবন ও সাহিত্য

কুলচন্দ্র দের ছোট মেয়ে রানীর জন্ম হয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। তিনি ছিলেন বাবার আদরের 'সরমাসুন্দরী'। কিন্তু মাত্র চার বছর বয়সেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তাঁর মা পূর্ণশশী তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকার গেণ্ডারিয়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে চলে যান। পেশায় পুলিশ হলেও তাঁর বাবা ছিলেন কবি। সেইসূত্রে কবির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁর বড়ো ছেলে মুকুল(জন্ম ১৮৯৫খ্রিঃ) ও সেজছেলে মনীষী (১৯০৬খ্রিঃ)কে চিত্রকলা শিখতে পাঠিয়ে দেন শান্তিনিকেতন। মুকুল পরে কলকাতার চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। থাকতেন আর্ট কলেজের দোতলায় বিশাল ফ্লাটে। নন্দলাল প্রায়ই যেতেন কলকাতায় মুকুলের কোয়ার্টারে। কখনো বসেও পড়তেন ছবি আঁকতে। রানীর আঁকা ছবি টেনে নিয়ে রঙে রূপে রসে ভরিয়ে তুলতেন সেগুলি। দেখে দেখেই রানী শিখে ফেলতেন অনেক কিছু। 'সব হতে আপন' গ্রন্থে রানী জানিয়েছেন-"বড়ো হয়ে আবার যখন কলকাতায় এলাম -নন্দদা আসতেন আমি ছবি আঁকতাম-সংশোধন করে দিতেন,রঙ দেওয়া শেখাতেন। খাতার পাতায় কত ছবি এঁকে দিয়ে যেতেন।"[১] নন্দদার কাছে এভাবেই ছবি আঁকায় উৎসাহ ও শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি ।

রবীন্দ্রনাথ মুকুলের বিরাট কোয়ার্টারে পুবদিকে খোলা বারান্দা, নীচে বাগান, পুকুর ইত্যাদির কথা শুনে যেতে চান। জল দেখতে খুব ভালোবাসতেন তিনি। সেইসময় অন্নপূর্ণা ও রানী তাঁর স্নেহস্পর্শে আসেন। রানী লিখেছেন- "আমরা দু বোন ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকি। পিতৃস্নেহবঞ্চিত প্রাণ -এতখানি স্নেহ-মমতা পাইনি কখনো জীবনে; গুরুদেবের কাছছাড়া হতে পারতাম না মুহূর্তের জন্যেও।"[২] দুই কিশোরীর বালখিল্যতায়, গল্পে, ছড়ায়, গানে রবীর অবসর সময় ভালোই কাটত। তিনি তাঁদের পড়াতেনও। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা মন দিয়ে দেখতেন রানী। তাঁর ছবির প্রতি আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল। অন্নপূর্ণা ভালো গান গাইতেন। কুলচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল তাঁর মেয়ে দুটিকেও শান্তিনিকেতনে পড়াবেন। কবি দুজনকেই নিয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণাকে সঙ্গীতভবনে আর রানীকে কলাভবনে ভর্তি করে দিলেন । রানী নন্দলাল বসু ও বিনায়ক মাসোজির কাছে ছবি আঁকা শুরু করলেন। দিল্লীর আইফ্যাকসের উদ্দ্যোগে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনী তাঁকে প্রচুর খ্যাতি ও পরিচিতি এনে দিয়েছিল। দিল্লী ও বোম্বে (বর্তমান মুম্বই)তে প্রদর্শনীর সূত্রে তিনি হয়ে ওঠেন ভারতের প্রথম নারী শিল্পী। কবির তিরোধানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাথে ছিলেন রানী। গুরুদেবের সঙ্গে দ্বৈতভাবে ছবি এঁকেছেন দু একবার। কলকাতার আর্ট কলেজে, শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনে আছে তাঁর মিউর‍্যাল। বুদ্ধকে নিয়ে আঁকা একটি চিত্রমালা পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উডকাট ও লিনোকাটের ওপর তাঁর অনেক কাজ আছে। লিনোকাটের ছবিগুলিতে সাদা-কালোর বিভাজন করেছেন নিপুণভাবে। তাঁর মৃত্যুর পর রানী চিত্রকলায় আগ্রহ হারান। অবনীন্দ্রনাথ তখন কৌশলে তাঁকে আবার চিত্রকলায় মনোযোগী করে তোলেন। দুজনে মিলে তৈরি করেছিলেন 'দুর্গা নাম জপ করা' নামে এক চিত্রমালা। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি

একদিন হারিয়ে যায়। রানী আফশোস করে বলেছেন- ‘এতকাল ধরে আমার শখ ছিল- আমার এই শেষ বইখানাতে শান্তিনিকেতনের সেই ছবিগুলো ছাপাব। তা আর হল না।[৩]

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দর সাথে মুম্বইতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই পৌরোহিত্যে রানীর বিয়ে হয়। সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয়েও পারদর্শী ছিলেন রানী; কবি দেশের নানা জায়গায় এবং বিদেশেও অনুষ্ঠানের জন্য যখন গেছেন তখন রানীও গেছেন গুরুদেবের সাথে, অংশ গ্রহণ করেছেন অনুষ্ঠানে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে আবার এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। নারীদের আলপনা আঁকতে শেখাতেন। শেখাতেন আশ্রমের আলপনার সঙ্গে নানা অঞ্চলের আলপনার চলের পার্থক্য।

গুরুদেবের নির্দেশে রানী লেখালেখিও শুরু করেছিলেন। তাঁর সব গ্রন্থই স্মৃতিচারণ। ‘গুরুদেব’ গ্রন্থে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নানাদিকের ছবি ফুটে উঠেছে। ‘সব হতে আপন’ গ্রন্থে ও তেমনি রবীন্দ্রনাথ,নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের স্মৃতিচারণ করেছেন নিবিড় মমতায়। পেয়েছেন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সম্মাননা। কবির শেষজীবনের অনেক লেখার তিনি অনুলেখিকা।

মহাত্মা গান্ধীর একান্ত অনুরাগিনী ছিলেন রানী। গান্ধীজির ডাকা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বিয়াল্লিশের আগস্ট থেকে প্রায় ৮ মাস কারাবণ করেন তিনি। কারাগারের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন জেনানা ফাটক। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর দিল্লী থেকে ফেরেন শান্তিনিকেতনে। দিল্লীতে থাকার সময় জওহরলাল নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হন ও তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৯৭ এ তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাময় জীবনের অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্রঃ-

১। রানী চন্দ, সব হতে আপন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৫।

২। রানী চন্দ, গুরুদেব, প্রথম প্রকাশ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ২।

৩। রানী চন্দ, সব হতে আপন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রানী চন্দর স্মৃতিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার স্তর বিন্যাস

রানী চন্দ তাঁর গুরুদেবকে পেয়েছিলেন নানারূপে- গুরুরূপে, পিতারূপে, সখারূপে এবং সাথী রূপে। এই অনুভবটি রানীর হয়েছিল যে, গুরুদেব করুণাধারার মতো তাঁর জীবনকে সিক্ত করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি (রানী) না হয়ে যদি আর কেউ হতেন তাঁকেও গুরুদেব এভাবেই স্নেহে আদরে আগলে রাখতেন।

মানবিক রবীন্দ্রনাথঃ- রানীর চোখে তিনি 'মহামানব', ধরা দিয়েছেন মানুষ হয়েই। পরকে আপন করতে পারে এমন লোক তিনি আর দেখেন নি। মানুষকে তিনি কাছে টেনেছেন, ভালোবেসেছেন। গুরুকে তাঁর ঘরের মানুষ, প্রতিবেশী বলে মনে হয়েছে।

সাংসারিক রবীন্দ্রনাথঃ- রানী ও অনিল চন্দ তখন নতুন দম্পতি। থাকেন মৃন্ময়ীতে। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন পাশের কোনার্ক বাড়িটিতে। নবদম্পতির বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম হতো। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য রাখতেন। সারপরপর জুতোর সার সার বারান্দায় দেখেই বুঝতেন। বাইরে কোথাও গেলে যেদিন ফিরতেন গুরুদেবের নির্দেশ ছিল সেদিন বৌঠান(প্রতিমা দেবী)এর কাছে খাওয়ার। এইসব সাংসারিক বিষয়েও যে তিনি কত সচেতন ছিলেন তার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় রানীর রচনায়।

খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথঃ- গুরুদেবের খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গেও খুঁটিনাটি খবর দিয়েছেন তিনি । গুরুদেবকে হাতের পরিবর্তে কাঁটা-চামচে খেতেন। কম খেতেন। সব মিলিয়ে দু-তিন চামচ পরিমাণ খাবার খেতেন। কিন্তু তাঁকে কম করে খাবার দেওয়া চলত না। থালায় বাটিতে করে সাজিয়ে দিতে হত। নানা রকমের রাতের খাবারের বর্ণনা আছে।

পোশাকের স্বকীয়তায় রবীন্দ্রনাথঃ- রানী চন্দর লেখায় গুরুদেবের পোশাক সম্বন্ধে জানতে পারি। কখনো পরতেন ধুতি-পিরান, কখনো পরতেন লুঙ্গি-পিরান। বাইরে গেলে সিল্কের লুঙ্গি বা পাজামা। নানা রকমের জোব্বা পরতেন। বাইরে গেলে দুটো জোব্বা লাগাতেন। ভেতরে একটা বুক ঢাকা আর ওপরের টা গলা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে সবটাই খোলা। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নানা রঙের জোব্বা পরতেন তিনি। কালো, ঘন নীল, বাদামী, কমলা, গেরুয়া, বাসন্তী, মেঘ -ছাই। সিল্কের,মোটা সূতীর ইত্যাদি। তাঁর এই জোব্বা তিব্বতি বাকুর আদলে তৈরি। আবার গুরুদেবের টুপি ছিল নতুন ধরনের । অন্য কারো সঙ্গে মেলে না। রবীন্দ্রনাথ নানা ঋতুতে নানা রঙের পোশাক পরতেন। এই ঋতুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথকে এমন করে আর কেউ চিত্রিত করতে পারেননি।

হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথঃ- মনের আনন্দে সবার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা রঙ্গরসিকতা করতেন দুই রানী(রানী চন্দ ও রানী মহলানবিশ)কে নিয়ে ঠাট্টা করে রানী চন্দকে বলতেন নয় রানী আর রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশকে

বলতেন হয় রানী। প্রশান্ত কত বড় কাজ করে কত টাকা মাইনে পায়, আর তাঁর স্বামী কিনা রবি ঠাকুরের সেক্রেটারি।

রবীন্দ্রনাথ বাড়ি বদল করতে ভালোবাসতেন। জীবনের শেষ দশ বছরে তিনবার বাড়ি বদল করেছেন। যে বিশেষ ধরনের স্থাপত্য শিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল আশ্রমে, তাঁর মুখ্য পরিকল্পনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব বোধের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি। প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে তারই মধ্যে তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে এক অভিনব পন্থায় নির্মিত এই স্থাপত্য ।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথঃ- রানী দাদা মুকুল দের ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথকে রেখায় রেখা মিলিয়ে ছবি আঁকতে দেখেছেন। পরবর্তীকালে আশ্রমজীবনে তিনিই একমাত্র যিনি গুরুদেবের আঁকার সময় কাছে থাকতে পারতেন। গুরুদেবের বেশির ভাগ ছবিই তাঁর চোখের সামনে আঁকা। জীবনের উপান্তে এসে ছবি আঁকার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন - এ তাঁর জীবনের এক ভিন্নতর প্রকাশ। নিতান্ত খেলার ছলে এঁকে গেছেন একের পর এক ছবি, ছবিগুলির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন তিনি। গুরুদেব ছবি আঁকতে বসলেই প্রায় ভেঙ্গে যেত পেন্সিলের সীস। তাই তিনিছবি আঁকতে বসলেই একগোছা পেন্সিল ছুরি দিয়ে কেটে তৈরি রাখতে হত রানীকে আর খেয়াল রাখতে হত, ছবি বিষয়সংলগ্ন রঙই তিনি দিচ্ছেন কিনা। কেননা রঙ বেছে ছবিতে লাগাবার অবসর রবীন্দ্রনাথের থাকতো না হয়তো আঁকছেন মানুষের মুখ, ছবি সম্পূর্ণ হওয়ার আগের মুহূর্তে তাতেই লাগিয়ে দিলেন কালো রং। এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হতো রানীকে। জল রং, তেল রং, পেলিক্যান স্পিরিট, পেন্সিল প্রভৃতি দিয়ে ছবি এঁকেছেন গুরুদেব। এইরকমই নানাবিধ রবীন্দ্রনাথকে রানী উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায় যা অন্যদের রচনায় দুর্লভ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রানী চন্দর রচনায় রবীন্দ্র পরিমণ্ডল

রানী চন্দ জীবনের অনেকখানি সময় শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেছেন। নানা লোক রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রমে এসেছেন। শিল্পের কাজে এসেছেন, আরো নানারকম কাজ নিয়েও এসেছেন। তাঁদের কথাবার্তা কখনো কখনো শুনেছেন। এঁদের কথা তাঁর রচনায় উঠে এসেছে, এসেছে বিভিন্ন আশ্রমিকের কথা, এসেছে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের কথা, বিদেশি ব্যক্তিদের কথাও। আমার এই গবেষণাকর্মে রানী চন্দর রচনায় রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের অধ্যায়টিতে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধানে যাব। এখন অতি সংক্ষেপে সেই নাম গুলি সম্পর্কে এবং দুই একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রানী চন্দর স্বামী অনিল চন্দর সম্পর্কটি ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন গুরুদেবের সচিব। তাঁর ছিল ভ্রমণের ব্যবস্থা, আশ্রমের নানা কাজকর্মের দায়, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার ভার। এছাড়া কবির শারীরিক সুবিধা অসুবিধাও তিনি দেখতেন। এসেছে অমিয়া ঠাকুরের কথা, এসেছে অমিয় চক্রবর্তীর কথা। লিখেছেন অমূল্য কৃষ্ণ বিশ্বাসের কথা, লিখেছেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র, নন্দলাল বসু, দিনেন্দ্র, কাদম্বরী দেবী, যামিনী রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ইত্যাদি ঘনিষ্ঠজনদের কথা। দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমলতা ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, অজিত কুমার চক্রবর্তী ইত্যাদিদের কথাও লেখা হয়েছে। রবীন্দ্র আত্মীয় বর্গের কথা বারবার উঠে এসেছে লেখায়। বিখ্যাত স্থাপত্য ইঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্রনাথ করের কথাও এখানে উঠে এসেছে। ১৯৩৪(জানু:)তে সরোজিনী নাইডু শান্তিনিকেতনে আসেন। তাকে যথোপযুক্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দেন তার সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। পরের দিনও একটি বক্তৃতা দেন তিনি, যার মূল কথা ছিল দেশসেবা। সরোজিনী নাইডু চলে যাওয়ার পরে ১৫দিন পর ১৯ জানুয়ারী ১৯৩৪ এ জহরলাল নেহেরু আসেন শান্তিনিকেতনে।

যেসব বহু দেশীয় বরেণ্য ব্যক্তি বারংবার এসেছেন গান্ধীজী তাঁদের একজন। বিশ্রাম ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আলোচনা করতে আসতেন মহাত্মা গান্ধী। এসেছেন জওহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সাথে সখ্যতা ছিল এমন দেশীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা তাঁর আলোচনা থেকে জানতে পারি। কুন্নুরের মহারাজা, হায়দ্রাবাদের এক ধনী জমিদার ধনরাজ গিরি, বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ নীলরতন সরকার, ডাক্তার জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, নগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, এঁদের সম্পর্কেও জানা যায় এই গ্রন্থ গুলি থেকে। বিভিন্ন বিদেশি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে আমরা বেশ কিছু নাম পাই- যেমন আরিয়ান এদেশীয় নাম হয়েছিল আর্য নায়কম, উইলমট পেরেরা ইত্যাদি।

হাজারীপ্রসাদ সম্বন্ধে এখানে একটি ক্ষুদ্র পরিচয় রাখা হল -- মদনমোহন মালব্য ওয়াসা আরজুর সুপারিশে ১৯৩০ এ শান্তিনিকেতনে হিন্দি ও সংস্কৃতর অধ্যাপক হয়ে আসেন হাজারি। নানা উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রানী চন্দর ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন ও রবীন্দ্রমানসে রানী চন্দর অবস্থান

বাবা যখন মারা যান তখন রানীর মাত্র ৪ বছর বয়স। মায়ের সঙ্গে ঢাকায় চলে যান তিনি ও তাঁর দিদি। সেখানে দেখেছেন মায়ের ট্রাঙ্কে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছবির সাথে ভালোবাসার সূত্রপাত তখনই। কলকাতা চৌরঙ্গীতে দাদার ফ্ল্যাটে এসে ছবি আঁকার সঙ্গী পান বড়দা মুকুল দে, নন্দলাল আচার্যকে। ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন বিরাট পুকুর, পুবদিকে খোলা বারান্দা, চারপাশে গাছপালা ইত্যাদি আছে শুনে এই মনোরম পরিবেশের ছবি আঁকার জন্য গেলে দুজনে তাঁর কাছটিতেই বসে থাকতেন আর তাঁর ছবি আঁকা দেখতেন। মনের খুশিতে রবীন্দ্রনাথ একটি একটি রেখা দিতেন, এক একটা ছবি ফুটে উঠত আর রানী হেসে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন মেয়েগুলির বয়স বাড়ছে, তাঁদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা দরকার; তাই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতন। যদি না নিয়ে যেতেন, ভারতের ১ম নারী শিল্পী হওয়া হয়তো হতো না রানীর। তাঁর কথায় তিনি ছবি আঁকাতেই মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাথে দ্বৈতভাবেও ছবি এঁকেছেন দু -একটি। সে ছবিগুলো প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

লেখায় বড় সংকোচ ছিল রানীর। কবির উৎসাহে ও আগ্রহে রানী লুকিয়ে লেখা শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ; চিকিৎসার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের অসুখ একটু ভালোর দিকে গেলে অবনীন্দ্রনাথ আসতেন রবিকাকে দেখতে। রানী তাঁর কাছে বসে স্বদেশি আমলের গল্প শুনতেন। কী সহজে সচ্ছন্দে গড়গড় করে ছবি আঁকার মত বলে যেতেন তিনি আর রানী লিখতেন। আশ্রমে ফিরে এসে যখন লেখার কথা আবার বললেন রবীন্দ্রনাথ, তখন সেই লেখাটি রানী তাঁকে দেখালেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথের এই লেখার সূত্র ধরে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারবে পাঠক। তাই তিনি রানীকে আবার জোড়াসাঁকোয় পাঠিয়ে দেন গল্প সংগ্রহ করতে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের অনুলেখিকা ছিলেন তিনি। এক একটি গল্প কতবার করে সংশোধন করতেন রবীন্দ্রনাথ দেখতেন অবাক হয়ে, শিখেও নিতেন ভাষার ব্যবহার। তিনিও ক্রমে হয়ে উঠলেন লেখিকা। গুরুদেবের প্রেরণা না পেলে কখনো কি লেখিকা হওয়া হত তাঁর? সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসাদ গুনে ভরা রচনাগুলি তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে পুরস্কার। পাঠকদের উপহার দিয়েছেন বেশকিছু গ্রন্থ যেমন- 'হিমাদ্রি(১৩৫৯বঙ্গাব্দ)', 'পূর্ণকুম্ভ'(১৯৫৯খ্রিস্টাব্দ), 'গুরুদেব' (১৩৬৯বঙ্গাব্দ), 'শিল্পীগুরু রবীন্দ্রনাথ'(১৩৭৯বঙ্গাব্দ), 'পথে ঘাটে(১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)', 'জেনানা ফাটক(জুন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ)', 'ঘরোয়া(১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে (১৩৫১বঙ্গাব্দ)' ইত্যাদি। 'পূর্ণকুম্ভ' রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। পেয়েছেন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সম্মাননা। তাঁকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' দান করে ক.বি.।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং দলের প্রয়োজনে রানী নাচ,গান, অভিনয়ও শিখেছেন। জীবন পূর্ণ হয়েছে পরম প্রাপ্তিতে। সবই তো গুরুদেবের আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রসৃষ্টিতেও রানীর কিছু অবদান আছে। কবি তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি রানী চন্দ কে নিজের কন্যার মতোই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছবি আঁকার সময় কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। । কিন্তু গুরুদেবের বেশির ভাগ ছবিই তাঁর চোখের সামনে আঁকা। নিজের রচনায় সে কথা স্মরণ করে বলেছেন রানী,- “তাঁর শেষ জীবনের ক'টা বছর তো তাঁর কাছেই কাটিয়েছি -গুরুদেবের বেশিরভাগ ছবিই আমার চোখের সামনে আঁকা। আজ ও বলতে পারি কখন কোন ছবি কোথায় বসে এঁকেছেন, আঁকতে বসে কি বলেছেন---- কোন মুডে এঁকেছেন।”[৩] রানীকে মডেল করে রবীন্দ্রনাথ অনেক ছবি এঁকেছেন যদিও ছবিগুলিকে পরে চেনা সহজ ছিল না যে কাকে দেখে তিনি এঁকেছেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে রানী ছিলেন অত্যন্ত আবশ্যিক। রবীন্দ্রনাথ রঙের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। কখন কোথায় কোন রং লাগিয়ে দেন ঠিক নেই। তাছাড়া আপন মনে রঙ দিতে গিয়ে এক রঙের জায়গায় আর এক রঙ লাগিয়ে ফেলতেন। একবার তো মুখে কালো রঙ দিয়ে ধেবড়ে দিতেন, যদি না থাকতেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ কিছু লেখালেখি করেছেন রানীকে অবলম্বন করে। একবার বললেন যে,’নারী’ কবিতাটি তাঁকে নিয়ে রচিত যদিও বিশ্বের নারীকে উপলক্ষ্য করে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায় যা লিখেছেন তা সবই রানীর অনুলিখন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওপরই এব্যাপারে ভরসা করতেন যে। এভাবে বুঝে নিতে পারা যায় রবীন্দ্র মনন ও সৃজনে রানী চন্দর কিছুটা ভূমিকা ছিল।

উপসংহার

রানী মহলানবিশ ও রানী চন্দর স্মৃতিকথায় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এসেছে দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ, কুটিল আবর্ত এখানে আভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্র মানসে এই দুই রবীন্দ্রস্নেহধন্যার স্থানটিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে এই গবেষণাকর্মে যা ভবিষ্যতের অনেক গবেষণাকর্মকে সাহায্য করবে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

আকরগ্রন্থ (Text Book)

১) নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'বাইশে শ্রাবণ', প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৬, একাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ৪১।

২) নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে', সম্পাদনা সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, সাগ্নিক বুকস, কলিকাতা ২৪।

৩) নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ৪১

৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, দশমসংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৯, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৩।

৪) রানী চন্দ , 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', প্রথম প্রকাশ বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৯, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, আইএসবিএন ৯৮১-৯৭৮-৮১-৭৫২২-৪৪৩-৮।

৫) রানী চন্দ, 'গুরুদেব', প্রথম প্রকাশ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭।

৬) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ , 'ঘরোয়া' , বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪০৯।

৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ , 'জোড়াসাঁকোর ধারে', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৫১, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪০৯।

৮) রানী চন্দ, 'সব হতে আপন', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ , আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭।

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ (Bengali Reference Book)

১) অমিতা সেন, 'আনন্দ সর্বকাজে', টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, রবীন্দ্রচর্চাভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৮ মার্চ ১৯৮৩।

২) কবিতা চন্দ, 'রানী চন্দঃজীবন, কুড়োনো কথায়', সূত্রধর, ৪৭/বি বোস পাড়া লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর,বাগবাজার,কলকাতা -৭০০০০৩। প্রকাশ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ।

৩) প্রতিমা ঠাকুর, 'নির্বাণ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৪৯ পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০১।

৪) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনকথা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬, একাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৮।

৫) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ অগ্রহায়ণ, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭ পৌষ।

৬) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ, ৩য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০৬।

৭) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ , ৩য় সং পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০৬ ।

৮) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রকাশ পরিবর্ধিত সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭১।

৯) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীজীবনী', প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা- ০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, পৌষ ১৪০০।

১০) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড,আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা- ০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯০, দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০০২।

১১) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৪।

১২) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীজীবনী', চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৩।

১৩) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯।

১৪) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীজীবনী', ষষ্ঠখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯৯।

১৫) প্রশান্তকুমার পাল, ‘রবীজীবনী’, সপ্তম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০৪।

১৬) প্রশান্তকুমার পাল, ‘রবীজীবনী’, অষ্টম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৭।

১৭) প্রশান্তকুমার পাল, ‘রবীজীবনী’, নবম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারী ২০০৪।

১৮) বিশ্বনাথ দে(সম্পাদনা), ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা -৭৩।

১৯) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পিতৃস্মৃতি’,জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস(প্রা. লি.),কলকাতা- ২৯, প্রকাশ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩,প্রথম সংস্করণ ১৩অগ্রহায়ণ ১৩৭৮,পুনর্মুদ্রণ২৫ বৈশাখ,১৩৯৫।

২০) সৌরীন্দ্র মিত্র, ‘খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭।

ইংরাজি সহায়ক গ্রন্থ (English Reference Book)

1. Krishna Kripalani, ‘*Rabindranath Tagore: A Biography*, Literary Licensing, LLC, First Edition 2013 ISBN 1258785269, 9781258785260.

সহায়ক পত্রপত্রিকা (Reference Magazine)

১) তাপস ভৌমিক সম্পাদিত কোরক (বিশেষ সংখ্যাঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব), দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।

_____________________________0_____________________________